উনিশ-বিশ শতকের বাঙালির সংগ্রাম ও সংস্কৃতির স্বরূপ : প্রসঙ্গ *অলীক মানুষ*

নিপা জাহান*

সারসংক্ষেপ : একটি সমগ্রতাস্পর্শী উপন্যাস কেমন হয়, তা জানতে পাঠ করা যেতে পারে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *অলীক মানুষ* উপন্যাসটি। যে রাজনীতি ও সংস্কৃতি বাঙালি মুসলিম ও বাঙালি হিন্দুকে পৃথক যাপন নির্ধারণ করে দেয়, এই উপন্যাস তারই শতবর্ষী ইতিহাস তুলে ধরে। এই ইতিহাসে খুব স্পষ্টভাবে উঠে আসে জন-ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ অথচ গভীর প্রবাহের রূপ। উনিশ-বিশ শতকের বাঙালির আচরিত কিন্তু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকভাবে অনাবিষ্কৃত জীবনসত্যের অনেক দিক এ উপন্যাসের উপজীব্য। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে জরাজীর্ণ ও ইতিহাসোত্তীর্ণ মানুষই আলোচ্য উপন্যাসের 'অলীক মানুষ'।

এক

অলীক মানুষ (১৯৮৮) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) রচিত মহাকাব্যিক উপন্যাস। উপনিবেশিত ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা প্রবাহের বয়ানে, দীর্ঘ কলেবর ও শতবর্ষী কালপরিসরের ব্যাপ্তিতে, চরিত্রায়ণ ও ভাষা-ব্যবহারের গাম্ভীর্যে এই মহাকাব্যিক নির্মাণের অভ্যন্তর ও আদল গঠিত। উপন্যাসটি বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকসমূহের অনুপুঙ্খ বাস্তবতার দলিল। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত হতে পারে ব্লার্ব-এ উপস্থাপিত এ উপন্যাস সম্পর্কিত মন্তব্য —

> উনিশ-বিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলিম পীর পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক ওতপ্রোত জীবনের কাহিনী 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের উপজীব্য। দীর্ঘ প্রায় একশো বছরের এই কাহিনী বস্তুত উপস্থাপিত হয়েছে কোলাজ রীতিতে, কখনও সিধে ন্যারেটিভ, কখনও 'মিথ' ও কিংবদন্তী, আবার কখনও ব্যক্তিগত ডায়রি, সংবাদপত্রের কাটিং মিলিয়ে-মিশিয়ে, দূর-ধূসর এক সময় এবং বিস্ময়কর কিছু মানুষের বৃত্তান্ত। সব মিলিয়ে আভাসিত করেছে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম জীবনের এযাবৎ অনাবিষ্কৃত একটি সত্যিকার ঐতিহাসিক সনদ। মর্তে নিয়ত আবর্তের নিদর্শন-অন্বেষী এবং ক্রমশ শূন্যমার্গে ধাবমান এক ধর্মগুরু, অন্যদিকে তাঁরই ঔরসজাত এক সন্তান। ঘটনা-পরম্পরায় ধর্মদ্রোহী হতে হতে নৈরাজ্যবাদী চেতনায় জর্জরিত — পরিণামে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সেই তরুণ নিষ্ঠুর ঘাতকে পরিণত হয়, — এই দুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বের হঠকারী ও নানামুখী টানাপোড়েন শক্তিমান ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আশ্চর্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাস একেবারেই অনন্যসাধারণ — সব অর্থেই ট্রাডিশন-বহির্ভূত। লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া বাস্তবতার পরস্পর-বিপরীত গতির মাঝখানে সংগ্রামরত মানুষ কীভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয় এবং কীভাবে সেই মানুষ 'মীথ'-এর বিষয় হয়ে ওঠে। এমন কুশলতায় আর কখনও বর্ণিত হয়নি। বহু অর্থেই এই উপন্যাস বঙ্গভূমির ইতিহাসের এক সন্ধিকালের প্রামাণ্য দলিল। (অরুণকুমার, ২০১১ : ২১০)

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেন — 'শিরদাঁড়া সিধা করে বসে পড়তে হয় এই উপন্যাস'।

দুই

অলীক মানুষ উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমি মূলত মুসলিমদের ওহাবি আন্দোলন এবং হিন্দুদের নব্য-হিন্দুজাতীয়তাবাদী আন্দোলন। উপনিবেশিত ভারতবর্ষের মুসলিম ও হিন্দুদের দুটি সম্প্রদায়গত আন্দোলন (প্যান ইসলামিক বা পিউরিটান মুভমেন্ট ও নিউ-হিন্দুইজম) কীভাবে স্বদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়, তা এই উপন্যাসে জটিল ঘটনাপরম্পরায় রূপায়িত হয়েছে। সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এই সমন্বয়কে ত্বরান্বিত করেছে। শতবর্ষের ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বন্দ্বপূর্ণ নানা ঘাত-প্রতিঘাত এই অঞ্চলের জটিল সমাজবিন্যাস ও জনমনস্তত্ত্বের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে কীভাবে ধারণ করে অগ্রসর হয়েছে, তার উপন্যাসন *অলীক মানুষ*। মূলধারার ইতিহাসের ভেতর যে স্তরীভূত ইতিহাস একটি জাতির ভাগ্যকে নির্মাণ করে চলে এই উপন্যাসে তারই বিশ্বস্ত বয়ান হাজির হয়েছে জটিল কাহিনিবিন্যাস ও ততোধিক জটিল চরিত্রায়ণের মধ্যে দিয়ে। ফরাজি মওলানা বদিউজ্জমানের 'বদুপির' হয়ে ওঠা ও তার পুত্র প্রকৃতিবাদী ও মানবতাবাদী শফিউজ্জামানের 'অ্যানার্কিস্ট ছবিলাল' হয়ে ওঠা এবং সমষ্টির ইতিহাস নির্মাণের সমান্তরাল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথক যাপনেও দুজন ব্যক্তির দুই 'অলীক মানুষ' হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত এই উপন্যাস — যা একইসঙ্গে নির্ধারণ করেছে সমষ্টির ঐতিহাসিক পরিণাম ও ব্যক্তির ঐতিহাসিক নিয়তি।

ক.

পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্রের একজন ফরাজি ধর্মগুরু সৈয়দ বদিউজ্জামান। ওহাবি মতের এই প্রচারকের কর্মকাণ্ড অনুধাবনের জন্য তথা এই উপমহাদেশে মুসলিম ধর্মানুসারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা বুঝবার জন্য ওহাবি আন্দোলনের স্বরূপ উদ্ঘাটন জরুরি। ওহাবি আন্দোলনকে ইসলামের 'পিউরিটানিক' বা অতিনৈতিক মতবাদ বলা যেতে পারে। এর গোড়াপত্তন হয় তের-চৌদ্দ শতকে ইবনে তাইমিয়ার উদ্যোগে। তিনি ইসলামি অনুশাসনের ইজমার প্রয়োগ নিষেধ করে প্রচার করেন —

> কুরআনের বিধি-ব্যবস্থা আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তার বাধ্য করতে হলে

> কুরআনেরই আশ্রয় নিতে হবে। হাম্বলী মযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী ইবনে তাইমিয়া যাবতীয় বেদাতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দান করেন এবং পীরবাদ ও তার আনুষঙ্গিক সব অনুষ্ঠানকে নিছক পৌত্তলিকতা বলে ঘোষণা করেন। (আবদুল : ২০১৭ : ৭৬)

এরপর আঠারো শতকের আরেক ধর্মসংস্কারক মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব-এর আবির্ভাব ঘটে। বহু বেদাত ও নানা অনাচারে নিমজ্জিত মক্কা ও মদিনা শহরের মুসলিমদের জীবনাচার থেকে এ-সবের মূলোচ্ছেদ করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। আর—

> তাঁর এই ভূমিকাকেই তার দুশমনরা বিশেষত ইউরোপীয়রা ওহাবী আন্দোলন নামে চিহ্নিত করেছে। তবে তাঁর আন্দোলনের শেষ পরিণতি অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যায়, মূলতঃ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হলেও বিশ শতকে এর দ্বারাই আরবি ন্যাশনালিযম পূর্ণভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। ইসলামের প্রথম যুগের মতো আবদুল ওহ্হাবও চেয়েছিলেন, সবরকম পৌত্তলিক অনাচারের মূলোৎপাটন করে খাঁটি তওহীদ বাণীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং আরবের সবরকম রাষ্ট্রনৈতিক গোলযোগের অবসান ঘটিয়ে শুধু ইসলামী সাম্য ও মৈত্রী-নীতির সূত্রে সমগ্র আরবভূমিকে এক রাষ্ট্রে বেঁধে দিতে। (আবদুল, ২০১৭ : ৭৬)

উল্লেখ্য, আরবদেশে 'ওহাবি' নামাঙ্কিত কোনও মযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এ সংজ্ঞাটির প্রচলন আরবদেশের বাইরে এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষত তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবি' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই এটি প্রচলিত। *রওযাত-অল-আফফার* গ্রন্থে আবদুল ওহ্হাবের সময়ে কতগুলি রেওয়াজ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত থাকার উল্লেখ আছে, সেগুলো পৌত্তলিক বা প্যাগান-রীতির অনুসরণমাত্র। যেমন — কবরে ফুল দেওয়া, দীপ জ্বালানো, খাবার দেওয়া; বৃক্ষপূজা করা। বলা বাহুল্য, এসব আচার-রেওয়াজ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পাকভারত উপমহাদেশে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৭৫৭ সাল অর্থাৎ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাভব-ঘটনা) মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়েছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে এদেশের শাসনদণ্ড একচ্ছত্রভাবে পরিচালনা করলেও মুসলমানের রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ হয়নি। প্রতিবেশী হিন্দুজাতি, বিদেশী বণিকজাতি ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এদেশের শাসনকার্য থেকেই কেবল মুসলমানদের বঞ্চিত করেনি; তাদের আর্থিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিল্প ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়েরও সূচনা করেছিল। এককথায়, মুসলমানদের ঈমান ও আমান নিরঙ্কুশ করে শত শত বছর ধরে বহির্বিশ্বে যে পাক-ভারত 'দারুল ইসলাম' নাম সুপরিচিত ছিল, সেখানে দৈব অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয় বিদেশী শাসকের অত্যাচার ও শোষণের ভয়াল গ্রাস। পলাশীর প্রান্তরে মুসলিম রাজশক্তির ভাগ্যবিপর্যয়ের পর থেকেই মুসলমান-মানসে এই উপলব্ধি জন্মেছিল যে, ইংরেজরা ক্রমশই সমগ্র পাক-ভারত অধিকার করে ফেলবে এবং নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত হিন্দুস্তানবাসীকেই স্বদেশে পরাধীন গোলামের জাতিতে পরিণত করবে। কিন্তু সমকালীন আলেম ও ধর্মনেতৃবৃন্দের মধ্যে দিল্লীর শাহ আবদুল আজীজই উনিশ শতকের প্রথমভাগে প্রকাশ্যে ফতোয়া জারি করেন

: বিদেশীর শাসনাধীন হিন্দুস্তান হচ্ছে 'দারুল হরব', যেখানে জেহাদ করা অথবা বিধর্মী অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্ত হয়ে হিজরত করাই খাঁটি মুসলমানের পক্ষে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এই উপলব্ধির ফলেই মুসলমানরা বারবার বিক্ষোভ-বিদ্রোহ করেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। তাই ছোট-বড় নানা বিদ্রোহে প্রায় শতাব্দীকাল অতিবাহিত করেছে মুসলমানগণ। এরই চরম রূপ দেখা গিয়েছিল ১৮৫৭ সালে। ১৮৬৪ সালের সীমান্ত অভিযান এর আরেক বহিঃপ্রকাশ। পাবনা ও রংপুরের ১৭৬৫ সালের ফকির বিদ্রোহ দিয়ে সংগ্রামী অধ্যায়ের ভূমিকা রচিত হয়েছিল; মাঝখানে তিতুমীরের বিদ্রোহে; হাজী শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার আন্দোলন; সৈয়দ আহমদ শহীদের অভ্যুত্থান ও বালাকোটের যুদ্ধ; পাটনায় শাহ্ ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির সংগঠন ও কার্যকলাপ: সিত্তানা, মূলকা, পঞ্জতরের ঘটনাসমূহে এর বিস্তৃতি। এবং ১৮৬৪ সালের সীমান্তের অভিযান ও সর্বশেষ পাটনা, আম্বালার ষড়যন্ত্র মামলায় সে সশস্ত্র সংগ্রাম-অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি (আবদুল, ২০১৭ : ৭৯-৮৩)। এই অঞ্চলের সশস্ত্র বা নিরস্ত্র এ-আন্দোলনের স্বরূপ ও তাৎপর্য ইতিহাসবিদের কলমে উঠে আসে এভাবে —

> ...পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকে ইংরেজের বিরুদ্ধে 'ওহাবী' নামাংকিত জেহাদী আন্দোলন এক বিশিষ্ট অধ্যায়। পলাশীর পর থেকে পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে প্রতিরোধ দেখা দিয়েছিল, তার প্রকাশ হতো মুসলমানদের দ্বারা। কোন রাজা, বাদশাহ বা রাজপুরুষের স্বার্থে এ আন্দোলন প্রচারিত হয়নি। বিধর্মী ও বিদেশী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাক-ভারতী মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া থেকে এর জন্ম। এ জেহাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চ-নীচু, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর মুসলমান; এবং একে সংগঠন করেছিলো ও পরিচালনা করে নেতৃত্ব দিয়েছিল এ যুগের ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলেম-সমাজ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজবংশের কয়েকজন এসে যোগ দিলেও এ আন্দোলনের কোনো সময় এর শক্তি কোনও নওয়াব-রাজার স্বার্থে কেন্দ্রীভূত হয়নি। দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না করলে ধর্মীয় সংস্কার করা যায় না। এবং দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে বিধর্মী রাজশক্তির উচ্ছেদ প্রয়োজন, মুসলমানদের এ বোধ ও উপলব্ধি সম্যক জন্মেছিল এবং এ বোধ জন্মানোর সঙ্গে আন্দোলনের রূপও বদলে তীব্রতর হয়েছিল। অবশ্য আন্দোলনের নেতাদের মনে দারুল ইসলামের কোনও পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে দানা বেঁধে ছিল কি না, বলা শক্ত কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, এই মনস্বী নেতাদের মনে কোনও দুর্বলতা ছিল না; কোনও স্বার্থবুদ্ধির নীচতা তাঁদের বিবেককে, তাঁদের শুভবুদ্ধিকে মোটেই আচ্ছন্ন করেনি। (আবদুল, ২০১৭ : ৮৬)

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে —

> আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অনুরূপ আন্দোলন হয়, তাহার সাহিত ওহাবীদের কোনো সম্বন্ধ ছিল এমন কোনও প্রমাণ নাই। ... ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত ... মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না — তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসেবে ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তিসংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। (আবদুল, ২০১৭ : ৯৮)

ওহাবি আন্দোলনের যে স্বরূপ আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এর প্রতিফলন আলোচ্য উপন্যাসে বিশ্বস্তভাবে ঘটেছে। উপন্যাসের 'কালো জিন এবং সাদা জিন বৃত্তান্ত' নামীয় প্রথম পরিচ্ছেদে বদিউজ্জামান সম্পর্কে বলা হয়েছে — '... তিনি ফরাজি ধর্মগুরু। পূর্ববাংলার প্রখ্যাত ফরাজি আন্দোলননের প্রবক্তা হাজি শরিয়তুল্লার মুরিদ-শিষ্য। প্রচণ্ড পিউরিটান' (সৈয়দ, ২০১৬ : ১২)। ইসলামের চারটি মজহাবের প্রবক্তা যথাক্রমে — ইমাম হানিফা (রা.) ইমাম সফিঈ (রা.) ইমাম মালিক (রা.) ইমাম হাম্বল (রা:)। ফরাজিরা ছিলেন শেষোক্ত অর্থাৎ হাম্বল-এর অনুসারী। আর তিনটি সম্প্রদায় থেকে তাদের ধর্মাচার পৃথক। উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদেই ফরাজি বদিউজ্জামানের ধর্মাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানান — 'হাত দুটো, নাভির ওপরে রেখে নামাজ পড়েন। সুরা ফতেহা আবৃত্তির পর উচ্চকণ্ঠে 'আমিন' বলেন। প্রার্থনা রীতি ও ধর্মীয় আচরণে অসংখ্য এমন পার্থক্য মেনে চলেন অন্য তিনটি মজহাব বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে' (সৈয়দ, ২০১৬ : ১২)। ওহাবি মতানুসারীগণ 'পিউরিটান' হওয়ায় এই মতে দীক্ষিত হবার পর কড়া অনুশাসন অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকে। বদুমৌলানার কার্যক্রম স্পষ্টতই ওহাবি মতানুসারী ধর্মগুরুর কার্যপন্থানুযায়ী পরিচালিত। খয়রাডাঙার জমিদার আশরাফ খান চৌধুরী যখন ফরাজিমতে দীক্ষা নেয়, সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মগুরুর নির্দেশানুযায়ী আগে দেউড়িতে রোজ সন্ধ্যায় নামাজের পর যে নহবত বাজতো, তা বন্ধ করে দেয়। ফরাজিমতে দীক্ষা গ্রহণের পর এ অঞ্চলের বেদাতি সব কর্মকাণ্ড স্বেচ্ছায় কিংবা জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উপন্যাসে প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী —

> গান-বাজনা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কড়া পরদার হুকুম জারি হয়েছে। খোঁড়াপিরের আস্তানায় হত্যে দেওয়া, মানত, আগরবাতি, পিদিম, কবরে মাথা ঠেকানো, জৈষ্ঠের শেষ রবিবারে বৈকালিক মেলা — সবকিছু বন্ধ। পিরের খাদিম বা সেবক, যাঁর মাথায় জটা ছিল, গেরুয়া কাপড় পরতেন, ঝাড়ফুঁক করতেন মাদুলি দিতেন, বেগতিক দেখে সদর শহরে পালিয়ে গেছেন। গুজব রটেছিল, বদুমৌলানা একশো লোক নিয়ে থান ভাঙতে আসছেন। (সৈয়দ, ২০১৬ : ১২)

কুতুবপুর থেকে যখন বদিউজ্জামান খয়রাডাঙা চলে আসবে তখন শিষ্যবৃন্দ অশ্রুপাত করে শোক প্রকাশ করছিল। তখন ওহাবি দীক্ষামতেই বদুমৌলানা বয়ান করে — 'আল্লাহ বলেছেন, কোনোকিছুর জন্য শোক হারাম। মৃতের জন্য শোক হারাম। নষ্ট হওয়ার জন্য শোক হারাম। কিছু হারানোর জন্য শোক হারাম। যে তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, তার জন্য শোক হারাম' (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৩)। কট্টরপন্থি ফরাজি হিসেবে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত আবদুলকে বদিউজ্জামান সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি। কারণ আবদুলের স্ত্রী ইকরাতন পৌত্তলিকতা ছেড়ে তওবা করেনি। মানবিকতার চেয়ে ধর্মীয় অনুশাসন ওহাবিদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো — এটি তারই দৃষ্টান্ত। আবার মৌলানার সহোদর অনুজ ফরিদুজ্জামান সুফি মতাবলম্বী হওয়ায়, তাকে অপদস্ত করে গৃহবিতারিত করতেও তার বাঁধেনি। বদিউজ্জামান-পত্নী সাঈদ-উন-নিসা ওরফে সাইদা, মা কামরুন নিসার কড়া পর্দাপ্রথা পালনের বাধ্যবাধকতা ও বদিউজ্জামানের যাপনের ব্যাপক অংশই

ওহাবি মতাদর্শের অবিকল অনুকরণমাত্র। তার বড় ছেলে নুরুজ্জামানকে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন ইসলামী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হতে। আবার তার ছোট ছেলে শফিউজ্জামানকে বারু মিয়ার পরামর্শে স্কুলে ভর্তি হবার অনুমতি দেয় রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে। তার ভাষ্য — '...ইংরেজের খ্রিস্টানি এলেম কিছু জানা দরকার। তা না হলে ওদের জব্দ করা যাবে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের জেহাদ এখনও খতম হয়নি। ...আমরা ওহাবি। ইংরেজ আমাদের দুশমন (সৈয়দ : ২০১৬ : ৫০)। মূলত আলীগড়ী ধারার শিক্ষিত প্রগতিশীল মুসলমান চৌধুরী আবদুল বারি। উল্লেখ্য, মুসলমানদের শিক্ষাবিস্তারে দেওবন্দ ও আলীগড় ধারাদ্বয়ের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। যদিও এ-দু'য়ে পার্থক্য বিস্তর। এ দুয়ের বড় পাথর্ক্যের দিক — '...দেওবন্দ কেন্দ্র উলেমাদের দ্বারা পরিচালিত এবং এখানে প্রাচীন ধারায় ধর্মীয় শিক্ষার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। অপরপক্ষে আলীগড়কে মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের পীঠস্থান বলা চলে। সেদিক দিয়ে এর একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল...' (সত্যেন : ২০১৬ : ২৯)। — দুই শিক্ষাকেন্দ্রের ধরন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বারি চৌধুরী শফিকে বলে —

> ...তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে মুসলমানকে। তুমি নিশ্চয়ই স্যার সৈয়দ আহমদের কথা পাঠ্য বইতে পড়েছ। দেওবন্দ যেখানে তৈরি করছে ছদ্মবেশী ভিখিরির দল, সেখানে আলিগড় তৈরি করছে নয়া জামানার প্রতিনিধিদের। কেন ছদ্মবেশী ভিখিরি বলছি, বুঝতে পারছিস তো শফি? তুই মৌলানাবাড়ির ছেলে। তুই বুদ্ধিমান। তোর বোঝা উচিত, এভাবে অন্যের দান হাত পেতে নিয়ে বেঁচে থাকাটা মনুষ্যত্বের অবমাননা। নুরুজ্জামানকে আমি বুঝিয়েছি। তাকে বলেছি, এটা ইসলামের প্রকৃত পন্থা নয়। নুরুজ্জামান মহা তর্কবাগীশ হয়ে ফিরেছে। কথায় কথায় সে কোরানহাদিশ কোট করে। কিন্তু এটুকু বোঝে না, মুরিদ (শিষ্য)দের ওটা ভক্তি নয়, আসলে দয়া। শফি, তোর আব্বাও এটা হয়তো টের পান। তাই তোকে ইংরেজি স্কুলে পড়তে দিয়েছেন। (সৈয়দ, ২০১৬ : ৬৪)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে দেওবন্দ ও আলিগড় ঘরানার শিক্ষা-পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য যেমন স্পষ্ট, এই দুই ধারায় শিক্ষিতদের মূল্যবোধগত ফারাকও তেমনি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসে বাঙালি হিন্দুর অগ্রসর অবস্থানের ফলে সামাজিক, আর্থিক, তথা রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব প্রায় এককভাবে তাদের কুক্ষিগত হয়েছিল। অপরদিকে মুসলিমদের অবস্থা ছিল কুসংস্কারাবদ্ধ, জড়তাগ্রস্ত ও স্থবিরপ্রায়। দেরিতে হলেও মুসলিম বিদ্বানগণ অনুধাবন করেছিলেন এ থেকে উত্তরণের জন্য পাশ্চাত্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাদপদ এই শ্রেণিকে দীক্ষিত করতে হবে। ফলে স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ এগিয়ে আসেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই প্রচেষ্টারই ফল। প্রথাগত ও সাবেকী ধাঁচ থেকে বের হয়ে আত্মসম্মান লাভের জন্য শিক্ষা অর্জনে তাই বারি চৌধুরীর এই আহ্বান। ইংরেজ রাজশক্তি ও সংখ্যাগুরু হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনতা থেকে পরিত্রাণের জন্য মুসলিমদের প্রস্তুতির আহ্বান এটি।

অর্থনৈতিক শক্তি ও সামাজিক প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সংস্কারমুক্ত মুসলিমদের ভূমিকা এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে নবাববাহাদুরের কাছারির দেওয়ান বারি চৌধুরী, বড়োগাজি সাইদুর রহমানের কার্যক্রমে। যদিও স্বার্থবুদ্ধি অপরাপর সামন্তপ্রতিভূর মতো বড়োগাজিকেও স্বসম্প্রদায়ের জন্য আদর্শিক নিষ্ঠায় স্থির হতে দেয়নি। তবুও স্কুলে সংস্কৃতের পাশাপাশি মুসলিম শিক্ষার্থীদের আরবি-ফার্সি শিক্ষা চালু করার মতো উদ্যোগ তার/তাঁদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ওহাবিদের মতো ধর্মানুশাসন না মেনে বরং মানবিকভাবে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে ঔপনিবেশিক মুসলমানগণ শিক্ষা আয়ত্ত করে এর প্রসারে ভূমিকা নিচ্ছিলেন। 'দারুল ইসলাম' পুনরুদ্ধারে আন্তরিক ও সংকল্পবদ্ধ হলেও এবং ইতিহাসবিদ-কথিত 'মনে কোনও দুর্বলতা' বা 'স্বার্থবুদ্ধির নীচতা' তাঁদের বিবেককে আচ্ছন্ন না করলেও যে কর্মপন্থা বা উদ্যোগ এক্ষেত্রে তাঁদের নেয়া উচিত, ওহাবিরা সেটা নিতে পারছিলেন না। বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বে তাঁরা দিশেহারা হচ্ছিলেন। তাই বারি চৌধুরী শফিকে বলে — 'তোর আব্বার মধ্যে বড্ড বেশি পরস্পর-বিরোধিতা। তিনিই বলেন, হিন্দুস্থান মুসলমানের 'দারুল হারাব' আবার তিনিই পয়গম্বরের কথা আওড়ান; উতলুবুল ইল্‌মা আলাওকানা বিস্ সিন' (সৈয়দ, ২০১৬ : ৬৪)। নব্যশিক্ষিত মুসলিম যুক্তিবাদীরা ওহাবিদের বিশ্বাসপূর্ণ যাপনে স্বসম্প্রদায়ের উত্তরণ প্রচেষ্টাকে উদ্যোগহীনতারই নামান্তর বলে ভেবেছেন। যদিও তাঁরা তাঁদের মত ও পথের সূত্রেই উদ্যোগী হয়েছেন সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা-বিস্তারের মহতী কাজে। উপন্যাসে দেখা যায় বদিউজ্জিমানের ইচ্ছা ও চেষ্টায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সেখানে শিক্ষার সুযোগও পেয়েছে। নুরুজ্জামানের অমত সত্ত্বেও মৌলানার সময়ে তাতে আলীগড়ী ধাঁচের শিক্ষাপদ্ধতি চালু হয়েছে ক্যালকাটা মাদ্রাসার অনুকরণে। মুসলিম ধর্মগুরু বদিউজ্জামান হয়ে উঠেছে সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী নমস্য ব্যক্তিত্ব। আবার 'দুনিয়া' ও 'পরকাল' উভয়কে গুরুত্ব দেবার কথা, 'আল্লাহর দুনিয়ায় সব মানুষ সমান' — এই কথা বিশ্বাস করেও সংকীর্ণ বিষয়বুদ্ধি থেকে দেওবন্দ-ফেরত নুরুজ্জামান বের হতে পারেনি। আবার যারা বদিউজ্জামানের সঙ্গে মিলে সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ব্যক্তিস্বার্থ বা খ্যাতি ও ক্ষমতার জন্য তারা দূরে সরে গেছে। যেমন — হরিণমারার বড়োগাজি পরে মুসলিম লীগ নেতা ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হয়। তরুণ ও বাগ্মী দিদারুল, যে একসময় মৌলবির একান্ত অনুগত ছিল, গঠন করেছিল 'তবলীগ-উল এছলাম সমিতি'; সেও যোগ দেয় মুসলিম লীগে। আবার জীবন ও অভিজ্ঞতার পরিণত এক ক্ষণে মানবতাবাদী প্রকৃতিবাদী শফিউজ্জামান আবিষ্কার করে ধর্ম মানুষে মানুষে ঐক্য তৈরির চেয়ে বিভেদ বেশি তৈরি করে এবং উচ্চারণ করে —

> ঘৃণা ধর্মকে — যা মানুষের মধ্যে অসংখ্য অতল খাদ খুঁড়ছে। ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা! ধর্ম নিপাত যাক। ধর্মই মানুষের জীবনে যাবতীয় কষ্ট আর গ্লানির মূলে। ধর্ম মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান করে। ধর্ম মানুষের স্বাভাবিক চেতনা আর বুদ্ধিকে ঘোলাটে করে। তার চোখে পরিয়ে দেয় ঘানির বলদের মতো ঠুলি। (সৈয়দ, ২০১৬ : ২০৭)

ফরাজি ধর্মগুরুর সন্তানের ধর্মবিদ্বেষী হওয়ার এই উপলব্ধির মূল ভারতবর্ষের সমাজমানস তথা জনমানসে নিহিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি — যা মানুষের 'মানুষ' পরিচয়কে কোণঠাসা করে তোলে এবং মানবিক বিশ্বাস ও ভালোবাসাপূর্ণ জীবন রচনার পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। শফিউজ্জামানের এই বোধের পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাস উপমহাদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের অনৈক্যের ইতিহাস।

খ.

মুসলিমদের আন্দোলনের ধারা ও স্বরূপ ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে। এবার নব্য-হিন্দুজাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ উন্মোচনের পালা। এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্রিটিশ ভারতের প্রথম যুগের হিন্দু সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম-সমাজের ভূমিকা বিশ্লেষণ। রাজা রামমোহন রায়ের হাতে সূচিত এই আন্দোলনে যুক্তিবাদী আধুনিক ভারতবর্ষের রূপকল্প প্রদীপ্ত হয়েছিল। সনাতন হিন্দুধর্মের যাবতীয় পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করে এ ধর্মের বৈদিক সূত্র ব্যাখ্যা করে একে একেশ্বরবাদী ও যুগোপযোগী হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেন। ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুসমাজের একাংশে এটি গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং ক্রমশ সামাজিক আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার পটভূমি তথা নব্য হিন্দু জাগরণের সূত্র খুঁজতে ভারতবর্ষের রাজক্ষমতা ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির হস্তগত হবার অব্যবহিত পরবর্তীকালের ইতিহাসপ্রবাহ অনুসন্ধান আবশ্যিক। কারণ এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের অনৈক্য গাঢ় হয়েছে যেমন, তেমনি এক দলের পশ্চাদগমন ও আরেক দলের সম্মুখবর্তী হওয়ার মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত হয়েছে। বিশেষজ্ঞের অভিমত —

> বাদশার জাত (মুসলমান) রাজ্য হারিয়ে — তার অনুশোচনা প্রত্যক্ষভাবে রাজত্ব হারানোর (পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে) দুঃখে ইংরেজের সংস্পর্শ এড়িয়ে নিজস্ব ঐতিহ্য ও অতীতকে শক্ত হাতে ধরে রাখতে চাইলেন। ... অপরদিকে, হিন্দু-সমাজে লক্ষ করা যায় ভিন্নরূপ। রাতারাতি বহু বাঙালি হিন্দু ধনী হয়ে উঠল। ইংরেজ রাজত্বের আগে যেখানে কলকাতায় ধনীর সংখ্যা ছিল বড় জোর জনাদশেক, ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে ইংরেজের ছত্রছায়ায় প্রচুর সংখ্যক বাঙালি প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠল। (স্বপন, ১৯৮৫ : ৪৫)

রাজত্ব হারানোর দুঃখবোধহীন হিন্দু-সমাজ সহজেই রাজানুগ্রহ লাভে আগ্রহী ও সফল হয়েছিল। অপরদিকে কৌশলগত কারণে রাজ্যহরণকারী ইংরেজগণ বিজেতা মুসলিম সমাজকে অবিশ্বাস করেছে, বিযুক্ত রাখতে চেয়েছে। এই সুযোগে একচেটিয়াভাবে রাজক্ষমতার মধ্যস্বত্বভোগী ও সহায়তাকারী হিসেবে হিন্দুসমাজের অধিষ্ঠান ও আধিপত্য কায়েম হয়েছে। 'কাঁচা টাকা', ও অতিক্ষমতায়নে হিন্দুসমাজে নেমে আসে বিকৃতি। ব্রাহ্মণ্যবাদের আচারসর্বস্বতায় হিন্দুসমাজ হয়ে ওঠে নৈরাজ্যময়। প্রচলিত

ধর্মীয় ও সামাজিক অব্যবস্থাপনা ব্যাহত না করে বরং পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং অনেকটা প্রলোভন দেখিয়ে শাসকগোষ্ঠী দৃঢ় করছিলো তাদের শাসনকাল — প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছিল রাজধর্ম অর্থাৎ খ্রিস্টানত্বের। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা এরই বহিঃপ্রকাশ। খ্রিস্ট ও ইসলাম-ধর্মের একেশ্বরবাদের ধারণা নিয়ে বিশেষত হিন্দুসমাজে বিদ্যমান পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব কাটিয়ে হিন্দুধর্মকে যুক্তিবাদ ও আধুনিকতার মানদণ্ডে উপস্থাপনের লক্ষ্যে রামমোহন রায় প্রচলন করেন ব্রাহ্মমতের। কারণ, তিনি অনুধাবন করেছিলেন, বেদ-উপনিষদের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হবার ফলেই হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস ও সমাজব্যবস্থায় অবনতি ঘটেছে। প্রাচীন আর্য ধর্মকে নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে এই উপমহাদেশের সঙ্গে বহির্জগতের এবং প্রাচীনকালের সঙ্গে সমকালের সমন্বয়-সাধনের পথ অনেকটা সুগম হল (আমিনুল, ২০১৫ : ১০৮-১১২)। উল্লেখ্য, রামমোহন রায় নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন অদ্বৈতপন্থি উপনিষদসমূহ থেকে। যেমন : যজুর্বেদে আছে – 'ব্রহ্মের প্রতিমা নেই।' মাণ্ডুক্য মতে — 'ব্রহ্ম অচিন্ত্য'; শুধু 'একাত্ম প্রত্যয়সার'। কঠোপনিষদে আছে — 'ব্রহ্ম বাক্য, মন, চক্ষুর অগোচর'। তাই তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন ব্রহ্মকে মূর্তরূপে পুজো নয়; আর অনুসরণ করলেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য — 'আয়মাত্মা ব্রহ্ম' এবং ঘোষণা করলেন : 'মূর্তিপূজা নয়, আত্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা'। ব্রহ্মমত গ্রহণ করলেন — কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার দত্ত, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ। দেবেন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক ব্রাহ্মদের মতে — উপনিষদই ব্রাহ্মধর্মের মূল ভিত্তি। উপনিষদ মতে — জগৎ ও জীবন পরিচালিত হচ্ছে পরম কল্যাণগুণনিদান ঈশ্বরের নির্দেশে। মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরই জগৎ ও জীবনের পরমসত্তা ও অবিসংবাদিত প্রভু। এর আগে ইউরোপীয় দর্শন পাঠে জেনেছিলেন — মানবজীবন পুরোপুরি প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতিদ্বারাই শাসিত। এ মতবাদ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল পরমসত্তার সন্ধানে এবং এ থেকে তিনি স্বস্তি পেলেন উপনিষদের উল্লিখিত বাণীতে। কিন্তু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য পণ্ডিতের মতে — উপনিষদ বা বেদান্তে জগতের স্রষ্টা পরমেশ্বরের কথা নেই। বস্তুত স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেম উপনিষদের অন্তর্গত নয়। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত বিবেচনা ও অক্ষয়কুমার দত্তের পরামর্শে দেবেন্দ্রনাথের মতান্তর ঘটে। অর্থাৎ উপনিষদ বা বেদান্ত ব্রাহ্মদের ভিত্তি — এ মত পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর তিনি 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'কে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎস ও আকর বলে গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মদের কেউ কেউ এই মতের বাইরে গিয়ে জ্ঞানচর্চা করেন, একেশ্বরবাদ থেকে পর্যবসিত হন নাস্তিক্যে। যেমন — অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ক্রমশ গতানুগতিক ধর্মের প্রতি আস্থাহীন এবং অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর এ মতের প্রতিফলন ঘটে *বাহ্যবস্তুর সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* গ্রন্থে (আমিনুল, ২০১৫ : ১০৮-১১২)। আলোচ্য উপন্যাসের আধাআধি পর্যায়ে এসে শফির পরিচয় ঘটে কপালীতলার জমিদারদের ছোটাতরফ বাবু দেবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যে —

> জাত-জোত মানতেন না। বলতেন, একো ব্রহ্ম দ্বিতীয়া নাস্তি। আমরা মানুষেরা সবাই পরম ব্রহ্মের একেকটি প্রকাশ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চেতনাময়। কান করে শোনো, প্রকৃতি জুড়ে ব্রহ্মের তান। বায়ুর মর্মরে, বিহঙ্গের কাকলীতে, নদীর স্রোতধ্বনিতে, পুষ্পের প্রস্ফুটনে, সর্বত্র আনন্দরূপ ব্রহ্মতান। তাঁরই আনন্দে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। বলে তিনি গম্ভীর গলায় গান গেয়ে উঠতেন। (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৭৩)

জাতিভেদ না-মানা দেবনারায়ণ রায়ের উদারনৈতিক মনোভাব শফিকে প্রভাবিত করেছিল। কারণ বিভেদ নয় ঐক্য — এটিই তাঁর চরিত্র ও আচরণে দৃষ্ট। ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবেলায় ভারতবর্ষের জাতিগত ঐক্যের কথা যে ব্রাহ্মমতালম্বীদের অনেকেই ভেবেছিলেন, তাঁদের কার্যক্রম এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। যেমন — আশ্রমে বাংলা নববর্ষ উৎসবে যথাক্রমে বেদ, বাইবেল, কোরান ও ত্রিপিটক পাঠ (সৈয়দ ২০১৬ : ২৫৪-২৫৫)। মুসলমান ও ব্রাহ্মদের সাধারণ মূলগত ঐক্য নিয়ে দেবনারায়ণ বলেন — মুসলমানদের তিনটি মূল কালচার। ইসলামি, পারিপার্শ্বিকগত হিন্দু কালচার ও শিক্ষাসূত্রে লব্ধ আধুনিক পাশ্চাত্য কালচার। ব্রহ্মদেরও তাই (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৮০)। ব্রহ্মসভার মুসলমান সভ্য মৌলবি আফতাবুদ্দিন সেই ঐক্যের বার্তা নিয়েই মৌলানা বদিউজ্জামানের কাছে গিয়েছিল এবং বলেছিল —

> ...দুনিয়ায় আল্লাহর ধর্ম একটাই। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বিভিন্ন নাম। হিন্দুস্তানে তাঁর নাম ব্রহ্ম। আরবে তাঁর নাম আল্লাহ। তাই আমি নামাজ পড়ি, আবার ব্রহ্মোপাসনাতেও যোগ দিই। ... হিন্দুস্তানের বর্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম ও মুসলমানদের ঐক্য প্রয়োজন। ব্রাহ্ম হিন্দুরা মুসলমানদের বেরাদর (ভাই) বলে জানেন। আপনাকে জানানো উচিত, ব্রাহ্ম পণ্ডিতদের কেউ কেউ পাক হাদিস কেতাবগুলান বাংলায় অনুবাদ করছেন। (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৯৬)

দেবনারায়ণও শফিকে উদাত্তচিত্তে জানান দেন — কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশে গিরিশচন্দ্র সেনের পবিত্র কোরান বাংলায় অনুবাদকরণ এবং এ-কাজের জন্য মুসলমানগণ কর্তৃক গিরিশচন্দ্রকে 'মৌলবি' খেতাব প্রদানের কথা। সঙ্গে সে এ-তথ্যও দেয় যে, এতে পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ চটে আগুন হয়েছে। উপন্যাসের অপর এক স্থানে সত্যচরণবাবু শফিকে কলকাতা ও ঢাকায় কিছুসংখ্যক সদস্য আছে জানান দিয়ে জিজ্ঞাস করেন — 'ইংরেজকে তাড়াইতে হইলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন কিনা?' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২৩৯) আবার ব্রহ্মপুরে শিবনাথ শাস্ত্রী উচ্চারণ করেন — 'মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! পবিত্র কোরাণগ্রন্থে আছে, পরমস্রষ্টা কু-উ-ন্ এই ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। এর অর্থ : হউক। অমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হল। আর আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে আছে, পরমস্রষ্টা ব্রহ্ম উচ্চারণ করলেন ওং– এই নাদব্রহ্মই সমগ্র সৃষ্টির মূলাধার' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২৪৮)। — এমন ঐক্যচিন্তা উদারপন্থী ব্রাহ্ম মতাবলম্বীগণ যখন প্রচারে ব্যস্ত ও প্রয়াসী অপরদিকে এর বিপরীত দৃশ্যও এই সমাজের অনেকেই রচনা করে চলেছে। শফি ও যামিনীবাবুর কথোপকথনে উঠে আসে ব্রাহ্মদের দলাদলির রূপ—

> ...ওদের নিজেদের মধ্যে মতান্তর আছে। সর্বত্র দলাদলি চলছে। একদল পইতে পরার বিরোধী — যেমন দেবুদা। অন্যদল চান ব্রাহ্মণের আধিপত্য। আচার্য হবেন শুধু ব্রাহ্মণ। পইতে ত্যাগ করেন না ব্রাহ্মণেরা। যাই হোক। দেবুদার কাছে যেসব ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোক এসে জুটেছেন, তাঁরা কিন্তু জমির লোভেই এসেছেন। বললাম মুসলমানদের সঙ্গে দেবনারায়ণদার খুব মিল। ...ক্রোশ পাঁচেক দূরে এক ইংরেজ সায়েব একটা রেশমকুঠি গড়েছে। তার নাম স্ট্যানলি! তার সঙ্গেও খুব মিল দেবুদার। (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৭৫)

এভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলার ব্যর্থ রূপ; কুসংস্কারমুক্ত আদর্শিক অবস্থানের স্বপক্ষে নয় বরং জমির লোভে আগত সভ্যদের বৃত্তান্ত এবং এই আন্দোলনের অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণাম ঔপনিবেশিক বিরুদ্ধাচারের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক শক্তিকে তোষণের চারিত্র্য। ব্রাহ্মদের মূল আন্দোলনের ধারার বাইরে এসে দেবনারায়ণ স্বপ্ন দেখে সাম্যবাদী সমাজ বিন্যাসের, যার রূপরেখা 'ব্রহ্মপুর সমবায় আশ্রম'-এর গঠন (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৮৬) চিন্তায় প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য নবযুগের বিপ্লবীরা রুশ বিপ্লবের 'সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্বের' যে মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েছিলেন, এখানে তার প্রমাণ মেলে। ইতিবাচক এই চিন্তাও আন্দোলনের মূলধারায় একীভূত ও সময়োচিত ছিল না বলে অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মদের কারো কারো চিন্তা ও উদ্যোগ ইতিবাচক হলেও যথাযথ কর্মপন্থা অনুসরণ ও যথার্থ দিকনির্দেশনার অভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রহ্মপুর শেষ পর্যন্ত দেবনারায়ণের বেহাত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই দৃষ্টান্তই স্থাপিত হয়। উপর্যুপরি ব্রাহ্মসমাজের প্রাত্যহিক আচারে নিরপেক্ষতার অভাব ও সম্প্রদায়গত বিভেদ এর প্রতিষ্ঠাগত লক্ষ্য থেকে ক্রমেই চ্যুত হচ্ছিল। তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একমুখীনতা যখন ব্রিটিশ বিতারণ, তখন ব্রহ্মসমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই কমবেশি ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু এখানে পূর্বতন ঐক্যের মন্ত্র অন্তর্হিত হলো, হিন্দু আচার-সংস্কার প্রায় নির্বিঘ্নহীনভাবে পালিত হতে থাকল। অবশ্য ব্রহ্মপুরের ব্যতিক্রম বাদে সবাই স্ব-ধর্মের আচার সংস্কার বা জাতপাত প্রথা মনেপ্রাণে বিসর্জন দেয়নি বরং বহুধর্ম-বর্ণের এমন সহাবস্থানে অস্বস্তিবোধ করছিল। যেমন, স্বাধীনের মা। কেউ আশ্রয়হীন, কেউ নিছক পেটের দায়ে ব্রহ্মপুরে জড়ো হয়েছিল। সমাজের অব্যবস্থাপনার দুর্বলতার সুযোগে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রতিষ্ঠার সুযোগে সেসবের নগ্ন প্রকাশ ঘটে মাত্র। তাই ক্রমশ নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রভাব ও অনুসরণ ঘটতে থাকে। গোপনে গোপনে ব্রহ্মপুরে এসে পৌঁছয় 'বন্দেমাতরম্ সমিতি', 'অনুশীলন সমিতি' 'স্বামীজি সংঘ'-এর কার্যক্রম। উগ্র হিন্দু-জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনপ্রিয়তম স্লোগান বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' হয়ে ওঠে হরিমোহন ও অন্যান্যের 'প্রেরণা' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২৫৮-২৫৯) অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনকারীগণ তাদের কর্মকাণ্ড জোরালোভাবে পরিচালনা করতে থাকে, যাদের নানামাত্রিক কর্মকাণ্ডের একমাত্র লক্ষ্য ব্রিটিশ-শাসনের অবসান-রচনা। তবে এই কর্মযজ্ঞে উপেক্ষিত হতে থাকে ভারতবর্ষের (মুসলমানগণ) অপর প্রধান জনশক্তি। অবমূল্যায়িত হতে থাকে তাদের শ্রম ও মেধা। শফিউজ্জামানের ডায়েরির বিবরণ অনুযায়ী — সে স্বামীজি সংঘের সদস্য হওয়ার পর লক্ষ্য করেন যে,

ক্লাবঘরে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও সাধু-সন্ন্যাসীদের ছবি টানানো, এদের সবাই হিন্দু। মাঝখানে দেবী কালীর প্রকাণ্ড এক ছবি, যাকে প্রণাম করে সকল সদস্য 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করে খেলতে যায়। আরেকটি প্রক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করেন। সেটি হলো — দেয়ালের তাকে একটি গীতা যাকে প্রণাম ও স্পর্শ করে সদস্যগণ শপথ করে — 'আমি দেশামাতৃকার জন্য প্রাণ-বলিদানে প্রস্তুত! ধর্মের প্রতি ঘৃণাবশত প্রথম প্রণামে শফির সংকোচবোধ হলেও পরে তা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। স্পষ্টভাবেই এই সংকোচ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে নয়। তবে শফি এটা স্পষ্ট অনুধাবন করেছিল — মুসলমান সমাজকেও সঙ্গে রাখার প্রয়োজন ব্রাহ্মদের কেউ মনে করলেও এসব আচার বিঘ্ন ঘটাবে এবং মুসলমানগণ বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। আবার শফি যেহেতু মুসলমান সে যদি এসব আচারের বিপক্ষে বলে তাহলে তাকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করার আশঙ্কা রয়েছে। কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলছে না দেখে সে আশ্চর্য হচ্ছিল। পরে পত্রমারফত গিয়াসুদ্দিনও তাকে এ বিষয়ে অবহিত করে এর বিহিত বিষয়ে ভাবতে জানায়। আরো জানায় দেবনারায়ণ রায়ের সাথে তার মতান্তরের কারণ সম্পর্কে। গিয়াসুদ্দিনের অভিমত —

> ব্রাহ্মগণ যে ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে ব্রতী, তাহা শুধু ধর্মকেন্দ্রিক নহে উপরন্তু মধ্যবর্তী প্রায় সাতশত বৎসরের মুসলমান শাসনকালের সভ্যতা-সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ সমন্বয়বাদী ধারাটির প্রতি তাঁহারা শীতল মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও মুসলমানদিগের কৃতিত্বের প্রতি অবলোকন করিতেছেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে দুই-চারিজন বাদে মোটামুটিভাবে সকলেই সুপ্রাচীন বৈদান্তিক এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ও সমুদয় তত্ত্বচিন্তাকেই প্রাধান্য দিতেছেন। ইহা শুভ লক্ষণ নহে। (সৈয়দ, ২০১৬ : ২৬৩)

উদ্ধৃতিতে ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানগণ সম্পৃক্ত হবার পর কেন বিযুক্ত বা নিবৃত্ত হয়েছেন, তার কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আবার উপনিবেশ-পূর্ববর্তী সভ্যতা-সংস্কৃতির সমন্বয়বাদী ধারাকে পাশ কেটে যাওয়ায় কীভাবে এই আন্দোলন স্বজাতির ইতিহাসের কক্ষপথচ্যুত হয়েছে তার অন্তর্নিহিত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মনোযোগহীনতা আবার কখনো ফ্যালাসি গুরুতর এই সমাজ-সংস্কৃতির সত্যকে অনুধাবনে অক্ষমতা এনেছে। শফিউজ্জামানের হরিমোহনের জন্মান্তরবাদ বিষয়ক প্রশ্ন এবং আরোপিত সিদ্ধান্ত– পূর্বজন্মে শফি হিন্দু ছিল; শফি তার কুলজী পারস্যদেশের খোরসান নির্দেশ করায় হরিমোহন তার সাথে শফির ঐক্য নির্দেশ করে 'আর্যরক্ত'-সূত্রে। এবং বলে — 'তুমি আর্য, আমিও আর্য। ... আর্যদের অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ এবং ঋষিদের বেদব্যাখ্যাই বেদান্ত! বেদমাতা গায়ত্রীই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গারূপে প্রকাশমানা হন। তিনিই ভারতবর্ষ। শফি, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ভারতাত্মার স্পন্দন আছে' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২১২)। এভাবে প্রাচীনকে নিজেদের পক্ষে টেনে ইতিহাসের সত্যকে পাশ কেটে যে 'আমিত্বময়' বর্তমানের নির্মাণ নবযুগের চিন্তকগণ করতে চেয়েছেন, তা স্পষ্টতই হাইপোথেটিক্যাল এবং অনেকটাই

ফ্যালাসিনির্ভর। দুইকে এক করার উদ্যোগ না নিয়ে তারা এক-কে সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী ছিলেন, যা প্রকৃতপক্ষেই 'শুভ' হয়নি। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ এই অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত। তা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ। অন্যভাবে বলা যায়, কখনো ইচ্ছাকৃত কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে এর চর্চা হয়ে আসছে। শফি লক্ষ্য করেছে, মিষ্টিবিক্রেতা হরিনাথ ময়রা কীভাবে বারি চৌধুরীর মত প্রভাবশালী ব্যক্তিকে গা-বাঁচিয়ে মিষ্টি ও পানি খেতে দিয়েছে বা মিষ্টির দাম গ্রহণ করেছে। আবার সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করিয়েছে নবাবি এস্টেটের ম্যানেজার প্রফুল্ল সিঙ্গির বাড়িতে আপ্যায়িত হবার ঘটনা। আবার সমাজমানসে বিদ্যমান দৃষ্টান্তই দিদারুলের মত তরুণ বাগ্মী মুসলমান নেতার কণ্ঠনিসৃত প্রশ্ন হয়ে ওঠে —

> আপনি কি ভেবেছেন, হিন্দুরা আপনাকে আপন বলে গ্রহণ করবে কোনদিন? সৈয়দজাদা! এ আপনার আকাশকুসুম খোয়াব। হিন্দুদিগের আপনি চেনেন না। যারা নিজেদের মধ্যে একজাতি অপরজাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, তারা মুসলমানকে ভেতরে-ভেতরে কী চোখে দেখে, নিজেই ভেবে দেখুন। (সৈয়দ, ২০১৬ : ২২০)

এভাবে হিন্দু-মুসলমানের ভেতরকার অবিশ্বাস বা আস্থাহীনতা তাদের সম্মিলিত কার্যক্রমের পথে উক্ত বা অনুক্ত বাধা হিসেবে জারি থেকেছে ভারতবর্ষে। ব্যক্তিক্রম সব সময়ই গোচরীভূত হলেও মোটাদাগের সত্যকে অস্বীকার করার সুযোগ এখানে কম। জাতীয় ঐক্যের বড় প্রয়োজনের সময়ও ছোট এসব ব্যাপার ছোট থাকেনি। নিজেদের আচরণ ছাড়াও সুবিধাভোগী তৃতীয়পক্ষ এসব ইস্যু নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে। অন্তত ইতিহাস সে-কথাই বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিনয় ঘোষের অভিমত। যিনি নব্যবঙ্গের ইন্টেলিজেন্সিয়ার বিকাশের ধারায় ট্রাজেডি বলে অভিহিত করেছিলেন 'বিদ্বৎসমাজের মুসলমানবর্জিত রূপ'কে। যাকে তিনি 'সাধারণভাবে 'বাঙালি বিদ্বৎসমাজ' না বলে, বিশেষ অর্থে 'বাঙালী হিন্দু বিদ্বৎসমাজ' বলাই যুক্তিসঙ্গত' (বিনয়, ১৯৭৮ : ২২) বলেছিলেন। তথ্য-উপাত্ত সহযোগে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ঘোষ দেখিয়েছিলেন —

> এই ট্র্যাজেডির রচয়িতা প্রধানত ইংরেজ শাসকরা, এবং কিছুটা উদীয়মান হিন্দু সম্ভ্রান্ত সমাজ বা বিদ্বৎসমাজ। উচ্চস্তরের হিন্দুসমাজে হিন্দুত্বপ্রীতির আধিক্য ছিল, বিসদৃশ আতিশয্যও ছিল। 'ধর্মসভার' পৃষ্ঠপোষকদের কথা বলা যেতে পারে, যদিও হিন্দুপ্রীতি আর মুসলমানবিদ্বেষ অভিন্ন মনোভাব নয়। ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজও প্রধানত হিন্দুসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, মুসলমানসমাজের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। (বিনয়, ১৯৭৮ : ২৫)

আবার হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি যখন পরিণত ও ক্রমবর্ধমান প্রাপ্তিকাঙ্ক্ষায় শাসকশ্রেণির মুখোমুখি এবং রাজনীতিতে শাসকের প্রতিপক্ষরূপে প্রতিভাত তখন শাসককুল সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি প্রয়োগ করে। মুসলিমদের সুযোগবৃদ্ধি ও হিন্দু-অবদমনে যার প্রকাশ। তাঁর মতে — উনিশ শতকের চতুর্থ পাদ থেকে বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যশ্রেণির তথা বিদ্বৎসমাজের বিকাশের আরম্ভ। এ উপন্যাসে বড়োগাজির রাজনৈতিক

উত্থান, দিদারুলের মুসলিম লীগ নেতা হওয়া, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ খানের সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রভাবশালী কর্মফিরিস্তি এর প্রমাণ বহন করছে। অপরদিকে এ সময় থেকে হিন্দু-সমাজের অধোগতি। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুসমাজের উদার-মানবতা ও সংস্কার-আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের পুনরুভ্যুত্থান আন্দোলনে পরিণত হল। 'হিন্দু' প্রীতি ক্রমে 'হিন্দুত্ব'-প্রীতির ভেতর দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতায়' পর্যবসিত হল। তিনি ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের এ-পর্বের হিন্দু ও মুসলিমকে যথাক্রমে 'গুহামানবের অন্ধকারযুগে পশ্চাদপসরণ' ও নিষ্ক্রিয় 'সিলুয়েটেড রিট্রিট'-দর্শকরূপে চিহ্নিত করেন (বিনয়, ১৯৭৮ : ২৭-৩১)। আলোচ্য উপন্যাসের দ্বিতীয় অলীক মানুষ শফিউজ্জামান মুসলিম পরিবারের সন্তান থেকে ক্রমে হয়ে ওঠে অ্যানার্কিস্ট ছবিলাল। তার এই বিকাশযাত্রা মুসলিম ধর্মীয় অনুশাসন থেকে প্রকৃতি-অনুধ্যান, সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য শিক্ষা, ব্রাহ্ম আন্দোলন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-চিন্তা বাহিত হয়ে ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকে সামাজিক কল্যাণভাবনায় উত্তীর্ণ এক পরিভ্রমণ শেষে কারাগারের নৈঃসঙ্গ্য ও আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের সামনেও নির্বিকার থাকে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দুই বিপরীত মেরুতে দুই ব্যক্তিমানুষকে তাদের যাপন ইতিহাসের দুই প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দেয়। পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী ব্যক্তিটি হয়ে ওঠে পির, তার কবর তার ইচ্ছের বাইরে পাকা করা হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তা পবিত্র ও পূজনীয় স্থান হয়ে ওঠে। অপরদিকে তীব্র বিদ্রোহী এক মানবতাবাদী হয়ে ওঠে মানুষ হত্যাকারী — ধর্মকে অস্বীকার করেও এক ধর্মে জন্মগ্রহণকারী আর আরেক ধর্মের পরিচয়ে মৃত্যুবরণকারী; যার মৃত্যুকে আবার স্বার্থান্বেষী উভয় সম্প্রদায় ত্বরান্বিত করেছে– কিন্তু বীররূপে গ্রহণ করেছে অগণিত মানুষ।

তিন

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অপরাপর আন্দোলন-সংগ্রাম ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রতিহত করতে সুসংগঠিত ব্যাপক-পরিসরের আন্দোলন ছাড়াও ধারাবাহিক প্রতিরোধ-বিদ্রোহ এই শাসনকে এ জাতির মনোগতভাবে মেনে না নেবার সাক্ষ্য দেয়। এসব আন্দোলন-সংগ্রাম প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছে। তবে এর প্রভাব প্রেরণা ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই শতবর্ষের ইতিহাসপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে এ-সবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মূল ধারার ইতিহাসপুস্তকের ক্রমিক সাল-তারিখে উল্লেখ না হওয়া ইতিহাস এ উপন্যাসে এসেছে জন-ইতিহাসের সামগ্রিক উপন্যাসিক রূপকে পূর্ণতা প্রদানের ঐতিহাসিক দায় থেকে। ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের আগেও আরেকটি সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। উপন্যাসে প্রাপ্ত বয়ান — 'ইংরেজি ১৭৪৪ সনে যে মেজর মনরো আড়াইশত বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের নলের মুখে বাঁধিয়া তোপের আগুনে উড়াইয়া দেয় (সেটি ভারতবর্ষের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ), এই শয়তান স্ট্যানলি তাহারই বংশধর। ওই সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী লোক ছিলেন' (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৯১)। শোষক বংশপরম্পরায় শোষক হয়েছে আর শোষিত

ঔপনিবেশিক আমলে বংশানুক্রমিকভাবে বিদ্রোহী হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে উপন্যাসে হাজির হয়েছে স্ট্যানলি ও শফির পরিণতি। ভারতবর্ষের প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ দমনকারী ইংরেজ স্ট্যানলির পূর্বপুরুষ, ১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহে তার পিতা একশ দুর্বৃত্ত দস্যু সংগ্রহ করে এ বিদ্রোহ দমনে সহায়ক হয়। স্ট্যানলি সে পথেরই পথিক। অপরদিকে মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজবিরোধিতাকারী শফির মাতামহ হাসু মির, তার মামাও কৈশোরে বাবার এ বিদ্রোহের অপরাধে ধৃত হয়েছিল। আবার শফির পিতামহী কামরুন্নিসার কাছে বালক বয়সে সে তার পিতামহের বিদ্রোহী সিপাহীদের সহায়তা করায় অশেষ নির্যাতন ভোগ করার গল্প শুনেছে। তার পিতা বদিউজ্জামান ইংরেজশাহীর দুশমন; শফিরও গন্তব্য এ পথেই। হরিণমারার বড়োগাজি বলে — 'বাঙালি হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে হিন্দুস্তান থেকে তামাম ইংরেজ ভাগিয়ে দেয়া যেত' (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৭০)। মুসলমানই কেবল এ-সময়কার নবোদ্ভূত প্রবল হিন্দু শ্রেণির বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছে না, এ শ্রেণিকে অবিশ্বাস জানিয়ে নেতিসম্বোধন করেছে অপরাপর সংখ্যালঘু বিদ্রোহীরাও। মুণ্ডাসর্দার বীরসা-র কর্মকাণ্ডের সূত্রে একথা স্পষ্টতা পায়। হরিনারায়ণের আক্ষেপ — '... দুঃখের বিষয়, শুধু ইংরেজ নয়, দেশবাসী হিন্দুদের বিরুদ্ধেও তার (বীরসার) ভীষণ আক্রোশ, আমাকে সে 'দিকু' বলে। একথার প্রকৃত অর্থ অসভ্য' (সৈয়দ : ২০১৬ : ২১১)। — শোষকের সহায়কশক্তি হওয়ায় স্ব-শ্রেণির স্বার্থ হাসিলে হিন্দুসমাজের একচেটিয়া কার্যক্রমই ঐতিহাসিকভাবে স্বদেশের অন্য ধর্ম-গোষ্ঠীর কাছে তাদের সন্দেহজনক ও নেতিবাচক করে তুলেছিল। উনিশ-শতকী শিক্ষিত হিন্দুদের সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলোর অধিকাংশই মুসলিমদের দ্বারা সংঘটিত ব্রিটিশবিদ্রোহের ঘটনাবলির প্রকৃত রূপ ও কারণ তুলে ধরেনি। নারিকেলবাড়িয়ায় ১৮৩১ সনে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার বিদ্রোহের সংবাদ-কাটিং রয়েছে উপন্যাসের ২০০ পৃষ্ঠায়। দিদারুল কর্তৃক সরবরাহকৃত পত্রিকার সংবাদ যে ঘটনার সত্যতা তুলে ধরেনি, বদিউজ্জামান সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে উষ্মা প্রকাশ করে। উপন্যাসের ২০১ পৃষ্ঠায় ১৮৩৭ সালের ২২ এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ছাপা হওয়া একটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়েছে। এই অংশে ফরিদপুর অঞ্চলে হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরাজি আন্দোলন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বদিউজ্জামানের বক্তব্য —

> ...মরহুম আব্বার কাছে শুনেছি, হাজি শরীয়তুল্লা একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন। হিজরি ১২১৮ কী, ১২১৯ সনে দিল্লিতে ওহাবি আলেম আবদুল আজিজ ফতোয়া জারি করেন, নাসারাদের বিরুদ্ধে মুসলমানের জেহাদে নামতে হবে। সইদ আহমদ বেরিলবি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। হিজরি ১২৭৪ সনে হিন্দুস্তানের তামাম হিন্দু-মুসলমান সিপাহী আংরেজশাহির সঙ্গে জেহাদ লড়েছিল। সেই জেহাদে ওহাবিরাও যোগ দিয়েছিলেন। হাজি শরীয়তুল্লা সেই রাহের (রাস্তার) রাহি। হিন্দুস্তানের মুসলমানকে বুত-পরস্তি (পৌত্তলিকতা), শের্ক (ঈশ্বরের অংশীদারি), বেদা'য়েত (উন্মার্গগামিতা) থেকে বাঁচাতে এই আলেম জানকবুল করেছিলেন। এই খতের (চিঠির) বয়ান বিলকুল ঝুট। (সৈয়দ, ২০১৬ : ২০১)

এভাবে উনিশ শতকব্যাপী এই ভূখণ্ডের নানা জাতি-ধর্মের মানুষের ইংরেজবিরোধী দ্রোহের বৃত্তান্ত এর কার্যকারণসহ এই উপন্যাসে হাজির করা হয়েছে — খণ্ডন করা হয়েছে এ-সব নিয়ে গড়ে ওঠা বিভ্রান্তি ও বিতর্কমূলক নানা তথ্য-ব্যাখ্যা। এমনকি উনিশ শতকের শেষাংশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম যুক্তিবাদী শিক্ষিত যে শ্রেণির উদ্ভব এখানে ঘটেছিল প্রচলিত ঐতিহাসিক ডিসকোর্সে তাদের বক্তব্যও গৃহীত হয়েছে এ উপন্যাসে, মূলধারার ইতিহাস যা ভুক্ত করেনি। বদিউজ্জামানের সঙ্গে দিদারুলের আলাপকালে মুসলিম-অবদমন ও মুসলিম বিদ্বেষে হিন্দুদের প্রবল চর্চিত যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে তার যুক্তি সে উপস্থাপন করে এভাবে — পলাশীর যুদ্ধে শুধু মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মাণিকচাঁদ, নন্দকুমাররাও বেইমানি করেছিল। ১৮৫৭ সনে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম একাট্টা হয়ে লড়লেও ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। আবার তার কলেজের হিন্দু বন্ধুরা তাকে যখন তামাসা করে বলে — 'তোমরা সাতশো বছর জুলুম করেছ। আমরা তা ভুলতে পারব না' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২০২) — তখন, সে উত্তর দেয় স্পষ্টভাষায় — 'এটা ইংরেজের শেখানো কথা' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২০২)। তার বক্তব্য– রাজাবাদশাহরা প্রজার ওপর যে জুলুম করে তা 'হিন্দু-মুসলিম'-এর বিষয় নয়, বিষয়টা থাকে 'রাজা-প্রজা'র। এ বিষয়ে তার মোক্ষম যুক্তি– ব্যাপারটা যদি মুসলিম রাজা কর্তৃক হিন্দু রাজার ওপর অত্যাচার হতো তাহলে হিন্দু ধর্মকে উৎখাতের চেষ্টা করা হতো, মন্দির ভাঙা হতো, হিন্দুস্তানে এত প্রাচীন মন্দির আর থাকত না। মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক হিন্দুদের মন্দির ভাঙার যে প্রচলিত মত আছে, সেটি সে খণ্ডন করতে মুর্শিদকুলি খাঁর কবরের পার্শ্ববর্তী স্থানে মন্দির থাকার উল্লেখ করে। হিন্দুরা ঔরংজেবের যে নিন্দা করে, সে তার বিপক্ষে যুক্তি দেয় খেয়ালি বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক তাজমহল নির্মাণ ও বিলাসিতায় রাজকোষ শূন্য করে দেবার বৃত্তান্তে। ঔরংজেবের হিন্দুবিদ্বেষ-এর বিপক্ষে তার যুক্তি– 'কেন তাঁর প্রধান সেনাপতি হিন্দু যশোবন্ত সিং? কেন উদিপুরী নামে হিন্দু বেগমকে তিনি মুসলমান করেননি?' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২০২) — এমন অজস্র যুক্তির ভিত্তিতে ইংরেজ কর্তৃক জিইয়ে তোলা সাম্প্রদায়িক দমন এই অঞ্চলের যুক্তিবাদী বিদ্বানগণ রুখে দিতে পারতেন। যেটি বাস্তবে হয়নি। তাই হিন্দু জমিদারগণ যখন কংগ্রেস গঠন করেন, মুসলমানদের এতে অংশগ্রহণকে ইতিবাচকভাবে মুসলিম সম্প্রদায় নেয়নি। মুসলমানরা ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দুর বিপরীতে মুসলমান বা মুসলমানের বিপরীতে হিন্দুর কর্মকাণ্ড মোটাদাগে পরিচালিত হয়েছে। আর এর ফায়দা নিয়েছে মধ্যবর্তী শাসকশ্রেণি। এ-দুয়ের সম্মিলন ও বিভেদহীনতায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপথ এ জাতির নিজস্ব ধারায় চলতে পারত — এটি বুঝবার মতো লোক সামান্য ছিল। তাই বঙ্গভঙ্গ হলো ১৯০৫ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রাখীবন্ধনের আয়োজন হলো। কিন্তু এই বিভেদ রোধ হলো না। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে গেল, ছড়াল দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে অসংখ্য

মানুষকে হতে হলো উদ্বাস্তু। দিলরুখ বেগম রুকুর নাতনী কচির সঙ্গে খেলতে আসা বালিকাটিও ১৯৪৭ সনের দেশভাগের শিকার। উপন্যাসের শেষ প্রান্তে জালালুদ্দিনের যে আগমন, তা ছিল গোপনীয়, কারণ তার পাসপোর্ট-ভিসা ছিল না। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের একাধিক রাষ্ট্রে পরিণত হবার সত্যতায় দুটি জাতির অবস্থা ও অবস্থান এখানে বাস্তবতায় রূপ পায়। এভাবে উনিশ-বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী নানামুখী আন্দোলনের ফলে ইংরেজ শাসনের ত্রস্ত অবস্থা, সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিস্তারের অন্তরালে রাজনৈতিক উদ্যেশ্যের বাস্তবায়ন; শেষপর্যন্ত পৃথক ভূখণ্ডের পরিচয় নিয়ে স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস তার মূলধারা ও উপধারার নানা সূত্র এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ডিসকোর্স আকারে হাজির হয়।

চার

জাতিগত বৈশিষ্ট্যে শংকর বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তার জন্ম-ইতিহাসের সমান বয়সী। আন্তঃজাতিগত দ্বন্দ্ব এবং বহিরাগত শক্তিকে গ্রহণ বা প্রতিহতকরণে বাঙালির প্রজন্মান্তরে জীবনসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। একটি জাতির বিকাশে পরস্পরবিরোধী মত-পথ-বৈশিষ্ট্য কীভাবে প্রভাব রাখে সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিদগণ তা নিয়ে বহু তত্ত্ব-আলোচনা করেছেন। আমাদের এ-পর্বের আলোচনায় ভারতবর্ষের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি কীভাবে উপরিকাঠামোর অন্তরালে বিরুদ্ধ মত বা উপাদানকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নির্মিত হয়ে আচরিত হয়েছে বা পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করেছে আলোচ্য উপন্যাস অবলম্বনে তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে করা হুমায়ুন কবিরের মন্তব্য —

> শিল্প ও সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমস্তই মানুষের সামাজিক মনোবৃত্তির প্রকাশ। সেই মনোবৃত্তির সংগঠনও হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জীবনের ফলে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু মতবাদের আজ যে রূপ, তার কতখানি বেদ-উপনিষদ থেকে নেওয়া এবং কতখানি যে ইসলামের দান, সে কথা সঠিকভাবে বলা কেবল কঠিন নয় — বোধ হয় একেবারে অসম্ভব। ঠিক তেমনিভাবে ভারতীয় মুসলমানের মানসিক নির্মিতিতে হিন্দু-প্রভাব সমান স্পষ্ট। এমন কি হিন্দু দর্শন ভারতের বাইরের মুসলমানের মনেও সেদিন ছায়া ফেলেছিল। সুফী মতবাদের ভিত্তি কোর-আনে, কিন্তু তার বিকাশে ভারতীয় ভাবধারার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। খৃষ্টধর্ম ও নিও-প্লাতোনিজমের ছোঁয়াও তাতে লেগেছিল কিন্তু তার উপর হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব বোধ হয় আরো স্পষ্ট। (হুমায়ুন, ২০১৫ : ১১)

অলীক মানুষ উপন্যাসের ফরাজি ধর্মগুরু সৈয়দ বদিউজ্জামান মুসলিম সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় পৌত্তলিকতা অপসারণ করতে চেয়েছে, পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে জনমানসে তার পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে 'বদুপির'। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক চিহ্নায়নের কাছে তাঁর আদর্শিক চিহ্নায়ন পরাজিত হয়েছে। পিরের থান ভেঙে দেয় যে বদিউজ্জামান, তারই মাথায় ওঠে সবুজ পাগড়ি। শফির কাছে সাইদা

তার এই বিবর্তন দেখে শ্লেষযোগে বলে — 'এতকাল দুনিয়া জুড়ে পিরদের সঙ্গে জেহাদ করে এবার নিজেই পির সেজে বসেছেন!' (সৈয়দ, ২০১৬ : ৭০) এদিকে ফরাজি মৌলানার প্রতিবন্ধী সেজো সন্তানের জন্য তার স্ত্রী সাইদা দরিয়া বানুর পরামর্শে খোঁড়াপিরের মাজারে গিয়ে সিন্নি চড়ায়। মনিরুজ্জামানের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে সাইদার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, খোঁড়াপিরের কল্যাণেই এটি হয়েছে। তাই যখন মনিরুজ্জামানের স্ত্রী রুকুর সন্তান হয়, তারও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সে পিরের থানে যায়। এভাবে ওহাবি মতাদর্শিক ধর্মগুরুর পরিবার এ আদর্শের বিপরীত আচারকে গ্রহণ করে। খোঁড়া পিরের মাজারে সাইদার সিন্নি দেবার ঘটনা মৌলানা বদিউজ্জামানের কানে গেলে সে এই মাজার ধ্বংস করে দেয় আর একটি চিরকুট পাঠায় স্ত্রীকে, যাতে লেখা ছিল — 'বেদা'য়াতে সাইয়্যেরা অতিশয় গোনাহের কাজ। সেই কাজগুলি হইল : কবরে সিন্নি মানত। কবরে নামাজ পাঠ, মাজার অথবা দরগাহ নির্মাণ। আমার ইন্তেকাল হইলে যেন এইগুলি না ঘটে' (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৯৫)। — উল্লেখ্য, তার মৃত্যুর পর সবই ঘটেছিল বলে উপন্যাস পাঠে জানা যায়। তাছাড়া ফরাজি এই মৌলানা যখন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়ে বাস করত, পূর্ববর্তী স্থানে তার প্রবর্তিত আচার-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতো। কারণ, সাময়িকভাবে এ ভূখণ্ডের মানুষ আরোপিত সংস্কৃতি পালন করতে বাধ্য হলেও তা অংশতই গ্রহণ করেছে বলে এখানকার সাংস্কৃতিক ইতিহাস-বিশ্লেষণে দেখা যায়। মৌলাহাট, বিশেষত মৌলানা বদিউজ্জামানের পরিবারের আচার-সংস্কারের বিবর্তন টের পাওয়া যায় তার পুত্রবধূ দিলরুখ ও প্রপৌত্রী কচি-র কথোপকথনে —

> কচি ॥...মৌলাহাটে আর কি সেই পিরিয়ড আছে? কজন ফরাজি আছে আর? আবার তো হানাফি হয়ে গেছে লোকেরা। ঘরে ছবি টাঙায়। গানবাজনা করে। মহরমে তাজিয়া করে। (হাসিতে অস্থির হয়ে) আর তোমাদের পির ফ্যামিলি কী করছে? বড়োদাদাজির বংশধররা? আমি বেপরদা হয়ে স্কুলে যাচ্ছি।...
> দি বেগম ॥ তোর আব্বা যত নষ্টের গোড়া। রফি ঠিক খোকার মত হিঁদুঘেষা ছিল। রফিকে বোঝায় কার হিম্মত? পিরের খান্দানি রফিই নষ্ট করেছিল।
> কচি। কখনো না। ছোটোদাদাজি। (সৈয়দ : ২০১৬ : ২২৪)

বংশপরম্পরায় আদর্শিক পরিবর্তন যুগদাবি হিসেবেই আবির্ভূত হয়। যারা পুরনো আদর্শ আঁকড়ে থাকে তারা 'সাবেক', আর প্রচলিতকে গ্রহণ করেই উত্তরপ্রজন্ম হয় 'আধুনিক'। এই পরিবারের কর্ণধারগণ পরিবর্তনশীল যুগের ধ্বজাধারী। পরিবর্তন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যেমন ঘটে, তেমনি ব্যক্তির বিকাশেও সমভাবে তা খাটে। তাই ফরাজি ধর্মগুরু, যে জীবনের বাস্তবতাসমূহকে ঐশী বিধি অনুসারে ব্যাখ্যা করত, সে-ও সুফি-উচ্চতায় উত্থিত হলো ঘটনাপরম্পরায় (সৈয়দ, ২০১৬ : ২৬৬)। হঠাৎ একদিন সে ভেতরে চমকে ওঠে এই ভেবে যে, সেও কি তার সুফি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফরিদুজ্জামানের মত খোদাপ্রেমে মস্তানা হয়ে উঠেছে! মৌলানা বহুপূর্বে তার এই ভাইকে সুফি হয়ে ওঠায় প্রহার করে বাড়ি

থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার মা এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাকে কখনো ক্ষমা করেনি। অন্যত্র সুফি মনসুর হাল্লাজ-এর বক্তব্য — 'আনাল হক! আমিই খোদা' (সৈয়দ, ২০১৬ : ১৯৪)। — উক্তিটি স্মরণ করে সে 'তওবা নাউজুবিল্লাহ' উচ্চারণ করে। এ উপন্যাসে মৌলানার পরিবার যেমন পিরের দরগায় যায়, তেমনি অনেক হিন্দুকে মৌলানার আশীর্বাদ-প্রার্থী হতে দেখা যায়। কৃষ্ণপুরের জমিদারকন্যা রত্নময়ীকে জ্বিনে পেয়েছে বিশ্বাস করে তার পিতা অনন্তনারায়ণ ত্রিবেদী তার সুস্থতার জন্য তাকে বদিউজ্জামানের কাছে পাঠায়। শফির স্কুলের বাংলার শিক্ষক হরিপদবাবুর মেয়ে বাণীকে ভূতে পেয়েছে মনে করে বদিউজ্জমানের কাছ থেকে তাবিজ আনে। তবে গোপনীয়তা রক্ষা করে এগুলো করা হতো, নাহলে একঘরে হবার ভয় ছিল। ভারতবর্ষের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের 'নেড়ে' বলা নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী ও গিয়াসুদ্দিনের আলাপে আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের একটি চুম্বকাংশ উঠে আসে। শাস্ত্রী বলেন —

> আর্যাবর্তে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি। ধর্মব্রতী অংশ বাদে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বিদ্যমান। পোশাকপরিচ্ছদ, ভাষা, এমনকি হিন্দু আর মুসলমানের নামেও ঐক্য সুপ্রচলিত। কিন্তু বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বিস্তর অনৈক্য। এই প্রদেশ ছাড়া কুত্রাপি মুসলমানদের যবন অথবা নেড়ে বলা হয় না। (সৈয়দ, ২০১৬ : ২১৪)

প্রতিবাক্যে গিয়াসুদ্দিন বলে — 'ইতিহাসবহির মর্মানুসারে সিদ্ধান্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপে বৌদ্ধরা আর্যাবর্ত থেকে পূর্বখণ্ডে চলে আসেন। তাঁরা ছিলেন মুণ্ডিতমস্তক। এতৎপ্রদেশেও ব্রাহ্মণ্য প্রকোপে তারা মুসলমান হন। সেজন্য সমূহ মুসলমান সম্প্রদায়কে 'নেড়ে' বলা স্বাভাবিক' (সৈয়দ, ২০১৬ : ২১৪)। আবার বাঙালির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সে বারবার বিসর্জন দিয়েছে তার ধর্ম, অর্থাৎ জীবন-জীবিকার প্রয়োজন তার আদর্শিক পরিচয়কে বিপর্যস্ত করেছে। হিন্দু নারী ইকরাতনের মুসলিম ডাকাত আবদুলের বউ হওয়া, কাহিন হয়ে জীবিকা নির্বাহ করা, বদিউজ্জামানের স্ত্রী হয়ে 'ইকরাতুন্নেসা' হয়ে ওঠা, আবার ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মপুরে আশ্রিতা হওয়ার মধ্যে দিয়ে উক্ত সত্যই প্রতিধ্বনিত হয়। আবার মুসলিম-সন্তান শফিউজ্জামান 'নেচার'-এর প্রভাবে নেচার-কেই সত্তাময়, উদ্দেশ্যময় ভাবে। অর্থাৎ ঈশ্বর নয়, নেচারই সৃষ্টির কেন্দ্রে বলে মনে করে। আবার গোবিন্দ সিংহকে জানায়, কোনো ধর্মে সে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু ব্রহ্মপুরে অবস্থানহেতু তার পরিচয় হয়ে ওঠে হিন্দু বা ব্রাহ্ম মতাবলম্বী। এভাবে জীবিকার অন্বেষণ কিংবা জীবনার্থের অন্বেষণে এই অঞ্চলের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংস্কার পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেনি। তাই মুসলমান বধূ হয়েও ইকরা 'কাহিন' ও পরে স্বৈরিণী হয়েছে, শফিউজ্জামান নাস্তিক হয়েও মৃত্যুপূর্বে প্রত্যাশা করেছে ধর্মগুরু পিতার অলৌকিকতা। অন্তর্নিহিত সমন্বয়বাদী এসব আচার-সংস্কারের ফলেই ভারতবর্ষের জনসাধারণ ভেতরে ভেতরে ঐক্য অনুভব করেছে, যদিও রাজনৈতিক কারণে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন চালিত হয়েছে।

পাঁচ

সাক্ষাৎকারে ঔপন্যাসিক জানান, সৈয়দ আবুল কাশেম মুহাম্মদ ওয়াদি-উজ-জামান আল হুসায়নি আল খুরাসানি ওরফে বদিউজ্জামান চরিত্রটি তাঁর পিতামহের আদলে তৈরি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পিতামহ ছিলেন ফরাজি। আর তাঁর পিতা জড়িত ছিলেন কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে। লেখকের ভাষ্যমতে, শফিউজ্জামান চরিত্রটা অনেকটা তাঁর বাবার ছায়া অবলম্বনে নির্মিত। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়গত আলোচনায় এটাই প্রতিষ্ঠা পায় যে, উনিশ শতকীয় মুসলিম ধর্মান্দোলনকারীর প্রতিভূ-চরিত্র বদিউজ্জামান। আর উপনিবেশ-বাহিত শিক্ষা-দর্শনের সংস্পর্শ ও উপনিবেশিতের শিক্ষা-দর্শনের দ্বন্দ্ব-উদ্ভূত জটিল সময়ের উদার বিপ্লবীর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র শফিউজ্জামান। মানবীয় আবেগ-সংবেদনে চরিত্রদ্বয় যেমন পৃথক দুই ব্যক্তি — তেমনভাবে ইতিহাসের ক্রান্তিকালের দুই নায়কও বটে। লেখক জানান —

> ...এই আখ্যানে প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র দুটি-ই চরিত্র–ধর্মগুরু বদিউজ্জামান এবং তার নাস্তিক, এনার্কিস্ট বিদ্রোহী পুত্র শফিউজ্জামান। ...এই দুটি মানুষ নিয়ে আমি এক ধরনের খেলা করতে চেয়েছি। একজন মনে করেন, মানুষের নিয়ন্তা ঈশ্বর। অন্যজন ধারণা পোষণ করেন যে, মানুষ নিজেই তার নিয়ন্তা। (তারাপদ, কোরক, ১৪০০ বঙ্গাব্দ)

উপন্যাসে উনিশ-বিশ শতকের এই উপমহাদেশের ইতিহাসের পাত্রপাত্রীর কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষণীয়। তিতুমীর, হাজী শরীয়তউল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — বাঙালির সামাজিক-রাজনীতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনসমূহের উদ্যোক্তা বা তত্ত্ববেত্তার চিন্তা, কর্ম ও আদর্শের বয়ান এই উপন্যাসে ধৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহের বাইরের চরিত্রগুলোর মধ্যে অনেকেই প্রচ্ছন্নভাবে সুদীর্ঘ এই ইতিহাসের নির্মাতা বা অংশ। হিন্দু ও মুসলিম পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানাদিকের উন্মোচন এসব চরিত্র সাহিত্যিক প্রয়োজনকে ছাপিয়ে ইতিহাসের অংশীদারিত্ব লাভ করেছে; এই উপন্যাসের চরিত্রায়ণের বিশেষত্বও এখানেই। আবার লোকজ দার্শনিক মেহেরুদ্দিন খামরু-র মতো অত্যাশ্চর্য বিরল চিন্তকের রূপায়ণে ঔপন্যাসিক তরঙ্গহীন জনইতিহাসের যে ফিরিস্তি পাঠককে শোনাতে চান, তার বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব ধরা পড়ে। উন্মত্ত রত্নময়ী কিংবা দুর্বোধ্য সিতারা নারীচরিত্রদ্বয়ের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে রোমান্সের আস্বাদ আনেন। 'আও শফিসাব, খেলুঙ্গি' — সিতারার এই সংলাপ আমৃত্যু শফিকে তাড়িয়ে ফিরেছে। নারী-চরিত্রের চিরন্তন রহস্যময়তা ও 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে'-র মতোই এক কাব্যিক রোমান্টিকতা সঞ্চারিত হয়েছে সিতারা-শফি আখ্যানে। এভাবে দীর্ঘ কলেবরের এক মহাকাব্যিক জীবন-পটভূমিতে নানামাত্রিক চরিত্রসমূহের ভাব ও ভাবমূর্তি এই উপন্যাসকে বিচিত্র জীবনানুসন্ধী কথনের খোরাক জুগিয়েছে।

অলীক মানুষ উপন্যাসের প্লটবিন্যাস, কাহিনিগ্রন্থন, ঘটনাবিন্যাস, বর্ণনারীতি — প্রায় সবই গতানুগতিকের প্রত্যাগমনের ফসল। সর্বতোভাবে একে 'আধুনিক উপন্যাস' বলে অভিহিত করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন —

> বাংলা উপন্যাসের সামর্থ্য-মাত্রা নিরূপণের জন্য এখন যে ক'টি উপন্যাস আমাদের পড়তে হবে 'অলীক মানুষ' তাদের অন্যতম। প্রায় একশত বছরের বাঙালি হিন্দুমুসলমানের জীবন এবং যন্ত্রণাকে সিরাজ অসামান্য আঙ্গিকে মূর্ত করে তুলেছেন। বহুভাষ সময়-সমজ-ব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন কিস্‌সা-গল্প, পুরাতন সংবাদপত্রের পাতা — প্রত্যক্ষ কথন, ব্যঞ্জনাময় ভাষণ, লোককথার আমেজ সব কিছুই। অলৌকিক এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রশ্রয় পায়নি। (সরোজ, ১৯৯০ : ৩৪৯)

ঔপন্যাসিক জানান যে, ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি কালের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। বস্তুত ইতিহাসকে উপন্যস্ত করতে গিয়ে সময়ক্রমকে ভেঙে দেয়া ঔপন্যাসিকের জন্য জরুরি ছিল। কারণ উপন্যাসে যে জীবনদর্শনের প্রতিফলন থাকাটা আবশ্যক, সেই আবশ্যকতার নিমিত্তে ইতিহাসের পুনর্বিন্যাস এখানে ঘটেছে। তাই অনুচ্ছেদধৃত বক্তব্যসার-সংবলিত শিরোনাম কিংবা কখনো কথনরীতির পরিবর্তনে কঙ্কালসার ইতিহাসের ভিতে রক্ত-মাংসের মানুষের সজীব অধিষ্ঠান সম্ভবপর হয়েছে। তিন প্রজন্মের প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ বয়ান, চিন্তা ও আবেগের প্রতিফলন; পরোক্ষ বয়ানে এসবের সমন্বয় ও ঘটনাস্রোতের অন্তঃপ্রবাহ রক্ষা — এই উপন্যাসের বয়ানরীতি মোটের ওপর এমনই। পূর্ববর্তী উপন্যাসকার হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র, কিংবা রবীন্দ্রনাথে এর কিছুটা আভাস মেলে। তবে প্লটবিন্যাসের এমন জটিল গ্রন্থনা দৃষ্টান্তরহিতই বলা চলে।

ছয়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ জানান, অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি লেখেন না। এই উপন্যাস তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও চর্চারই ফসল। স্বভাব-গম্ভীর এই ঔপন্যাসিক জীবনের নানা প্রান্ত ছেঁকে-ছেনে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করেছেন বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র ভাষা ও বিচিত্র মনস্তত্ত্বের নির্মাণ ও প্রতিফলনে তারই প্রকাশ *অলীক মানুষ*। ইতিহাসের ধারায় একটি জাতির নিবাস, মূল্যবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতি কীভাবে রূপান্তরিত হয়ে নতুন এক সমাজ, আদর্শ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির নির্মাতা হয়ে ওঠে তার এক জটিল সমীকরণ এই উপন্যাস। শতবর্ষের বাঙালির ইতিহাসের নানা স্তরকে উন্মোচন করতে গিয়ে তিনি মানুষের কথা, আখ্যান, অনুভবকে সযত্নে তুলে ধরেছেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে এখানেই তাঁর সার্থকতা। অনেক তত্ত্ব, অনেক দর্শন, অনেক ভাষা ও অনেক সংস্কৃতির যে সমন্বয় এই উপন্যাস ধারণ করে আছে, তাতে মুখ্য মানুষ এবং মানুষকে কেন্দ্র করেই এর যাবতীয় আয়োজন। তাই ইতিহাস-উত্তীর্ণ মানুষ তাঁর ভাষায় হয়ে উঠেছে 'অলীক মানুষ'। বিস্তৃতি, ব্যাপকতা, গূঢ়ার্থ ও কৌশলী বয়ানে এই উপন্যাস হয়ে উঠেছে এক মহাকাব্যিক প্রতিবেদন।

সহায়কপঞ্জি

গ্রন্থ

অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ [সম্পা.] (২০১০)। *উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১১)। *বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আবদুল মওদুদ (২০১৭)। *ওহাবী আন্দোলন*, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

আমিনুল ইসলাম (২০১৫)। *বাঙালির দর্শন : প্রাচীন থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স (সপ্তম মুদ্রণ), ঢাকা।

আলবেয়ার কাম্যু (১৯৮৩)। *দি আউটসাইডার*, মুনতাসীর মামুন অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (২০১০)। *গল্পসমগ্র*, ভাষান্তরিত : অমিতাভ রায়, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (২০১১)। *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*, ভাষান্তরিত : জিএইচ হাবীব, নান্দনিক, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা।

দেবেশ রায় (১৯৯১)। *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

— (১৯৯৪)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য [সম্পা.] (২০০১)। *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*, সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা।

বিনয় ঘোষ (১৯৭৮)। *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল [সম্পা.] (২০১৪)। *বিশ শতকের সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯৮)। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুনীর চৌধুরী (২০১৪)। *মীর-মানস*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা।

সত্যেন সেন (২০১৩)। *বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, সাহিত্যিকা, ঢাকা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯০)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (২০১৬)। *অলীক মানুষ*, দে'জ পাবলিশিং, বিংশ সংস্করণ, কলকাতা।

স্বপন বসু ১৯৮৫। *বাংলা নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি (২য় সংস্করণ), কলকাতা।

পত্র/পত্রিকা

অলোক গোস্বামী, জানুয়ারি (২০০৩)। পৌষ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, *গল্পবিশ্ব*, ২য় সংখ্যা, কলকাতা।

তারাপদ ঘোষ (১৪০০ বঙ্গাব্দ)। *কোরক*, শারদীয় সংখ্যা, কলকাতা।

নাজিব ওয়াদুদ, জানুয়ারি-এপ্রিল (২০০৩)। *নন্দন*, সপ্তম সংখ্যা, রাজশাহী।